# আনন্দময় সেই দিনগুলির কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা
পূর্বতন সম্পাদক, উদ্বোধন পত্রিকা(কার্তিক ১৩৯৪--জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮)

ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কৃপায় আমার অশেষ সৌভাগ্য হয়েছিল--খুব কম বয়সে *উদ্বোধন* পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হতে পেরেছিলাম। প্রথম থেকেই আমার এবিষয়ে ভয় ছিল; কারণ তখন আমার বয়স কম---- মাত্র ছত্রিশ, অভিজ্ঞতাও কম। মঠের নির্দেশে পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছর যাবৎ সে-দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। মায়ের অশেষ কৃপায় এটা সম্ভব হয়েছে। আজ এরকম শুভ দিনে সেই আনন্দ আরো বেড়ে যায়। স্বামীজীর স্বপ্নের *উদ্বোধন*-এর বিজয়যাত্রায় অঙ্গীভূত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়।

*উদ্বোধনে* আসার আগে পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর অধ্যক্ষতায় গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে প্রকাশনা বিভাগ দেখতাম। মনে আছে, উদ্বোধনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭। ২৬ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার পূর্বতন সম্পাদক পূজনীয় স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর কাছ থেকে *উদ্বোধন*-এর বিষয়ে নানান পরামর্শ ও কাজের বিষয়ে সম্যক ধারণা পেয়েছিলাম। ধারণা অবশ্য কিছুটা আগে থেকে ছিল, কিন্তু এখানে এসে মহারাজের কাছ থেকে যা শিখলাম তা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী প্রমেয়ানন্দজী ছিলেন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, একইসঙ্গে গভীর অনুভূতিশীলও। ঐ সাত-আট দিন উনি যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন তা অবলম্বন করে আমি অনেক কিছু করতে পেরেছি। যদিও তিনি খুব বেশি দিন *'উদ্বোধন'*-এর দায়িত্বে ছিলেন না, কিন্তু তারই মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণ করেছিলেন। যেমন---তাঁর আগে *উদ্বোধন* পত্রিকার প্রকাশ নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পিছনে চলত। দেখা যেত, এক মাসের পত্রিকা পরের মাসে কিংবা তার পরের মাসে বেরচ্ছে! সে-কারণে ডাকবিভাগে সঠিক সময়ে পত্রিকা পোস্ট করা যেত না। এতে নানা সমস্যা তৈরী হতো। তিনিই প্রথম সমস্ত কিছুকে একটা নির্দিষ্ট সময়সারণিতে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন--- মাত্র দেড় বছরের মধ্যে। তিনি ঠিক করেছিলেন, প্রতি সংখ্যা তিনি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে জি. পি. ও. ডাকে দিতেই হবে। এই নিয়মানুবর্তিতা আমার সময়েও অনুসরণ করেছি। এটাও আমাদের কাছে গর্বের যে, উদ্বোধন আজ সেই ধারায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঠিক সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। নেপথ্যের এই বিরাট কর্মযজ্ঞ পাঠক সাধারণ হয়তো জানেন না।

স্বামী প্রমেয়ানন্দজী অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। সময় বিষয়ে সর্বদা ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। প্রত্যেক মাসের নির্বাচিত লেখাগুলি উনি সুন্দরভাবে আলাদা আলাদা ফাইলে রাখতেন, যাতে সহজেই সবটা হাতের নাগালে পাওয়া যায়। আমিও আমার সময়ে এটা করেছি। দেখেছি কাজের কত সুবিধা হয় এতে। মহারাজ বলেছিলেন--- আগে পৌষ মাসে বর্ষসূচি তৈরী করার সময় সকলের ঘুম ছুটে যেত! স্বামী প্রমেয়ানন্দজীই প্রথম প্রতি মাসে এটা তৈরী করে কাজটাকে সহজ করে দেওয়ার নিয়ম করে দিয়েছিলেন।

সেসময় *উদ্বোধন* পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে থাকত মায়ের বাড়ির অধ্যক্ষের নাম। প্রকৃত সম্পাদকের নাম থাকত সংযুক্ত সম্পাদক হিসাবে। সেসময় মায়ের বাড়ির অধ্যক্ষ ছিলেন পূজনীয় মোহিত মহারাজ--- স্বামী নির্জরানন্দজী। দুপুরে ও রাতে প্রসাদ গ্রহণের সময় তিনি বসতেন প্রথম আসনে আর আমি তাঁর পাশে। আমি এসে দেখেছিলাম অধ্যক্ষের পাশের আসনে পূজনীয় স্বামী প্রমেয়ানন্দজী বসতেন। আগে

থেকেই এই ধারা ছিল। ১৯৯৩ সালে প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, প্রকৃত সম্পাদকের নাম সম্পাদক হিসাবেই লেখা হবে এবং অধ্যক্ষ মহারাজের নাম রাখা থাকবে ব্যবস্থাপক সম্পাদক হিসাবে। আমার সৌভাগ্য, এই ধারায় প্রথম সম্পাদক হওয়ার সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল।

পত্রিকার কাজে দায়িত্ব নেওয়ার পর তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ মহারাজ পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি। মহারাজ বলেছিলেনঃ "দেখ, উদ্বোধন বুড়ো-বুড়ির পত্রিকা হয়ে গেছে! বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি উদ্বোধনকে লাল শালুতে মুড়ে রেখে দেবে, মাথায় ছুঁয়ে প্রণাম করবে, কিন্তু পড়বে না। এটা স্বামীজী চাননি। উদ্বোধনকে আমাদের জীবনের অঙ্গ করতে হবে, সকলের পত্রিকা করে তুলতে হবে--পারিবারিক পত্রিকা। পরিবারের সকলেই অপেক্ষা করে থাকবে-- কবে পত্রিকা বাড়িতে আসবে। আট থেকে আশি পর্যন্ত সকল বয়সের মানুষের কাছে উদ্বোধনকে গ্রহণযোগ্য করতে হবে।" পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলামঃ "মহারাজ, আমি কী করে তা করব?" মহারাজ বলেছিলেনঃ "ওগুলো তোমায় করতে হবে। আমি তোমায় আইডিয়া দিতে পারি মাত্র স্বামীজী যেমনটা চেয়েছিলেন। কী করে করবে সেটা তোমাকেই ভাবতে হবে। কার্যকর করার দায়িত্ব তোমারই।" এসব শুনে আমার চাপ বেড়ে গিয়েছিল। রোজ মায়ের কাছে যেতাম আর বলতামঃ "মা, তুমি আমার সঙ্গে থাক।" *'উদ্বোধন'* সত্যি সত্যি পারিবারিক পত্রিকা হয়ে উঠল। পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের প্রত্যাশা পূর্ণ হলো। একদিন বিকেলে অফিসে কাজ করছি। একজন ভক্ত মহিলা পত্রিকা সংগ্রহ করে সেটি হাতে নিয়ে আমার অফিসে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর সাত-আট বছরের মেয়ে। দেখছি মেয়েটি পত্রিকাটি ধরে টানছে। মা বলছেন, "বাড়িতে গিয়ে নিবি।" আমি বললাম, "কি হয়েছে?" মহিলা বললেন, " মহারাজ, পত্রিকাটি এখনই ওর চাই। ও পড়বে।" আমি বললাম, "কেন? এখনই কেন?" মহিলা বললেন," ছোটদের পাতাটি ওর খুব প্রিয়। পত্রিকা এলে আগে ও নেবে এবং ঐ পাতাটি পড়বে। " পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী মহারাজের কথাটি মনে পড়ল। *উদ্বোধন* সত্যি সত্যিই তো পারিবারিক পত্রিকা হয়ে উঠেছে!

এর মধ্যে একদিন তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ মায়ের বাড়িতে এলেন। আমার ডাক পড়ল। তাঁকে সেসময় সকলে ভয় পেতেন। খুব রাশভারি আর রাগী প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সমবয়সিরাও তাঁকে ভয় পেয়ে একটু দূরে দূরে থাকতেন। তিনি আমায় বললেনঃ " উদ্বোধন-এর এই যে সাইজটা--এ আমার পছন্দ না। এটা কী তুমি করেছ?" তখন উদ্বোধন আজকের চেহারায় ছিল না, লম্বায় ও চওড়ায় সেটা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের--- বলা যেতে পারে, সেই সময়ের বিচারে আজকের চোখে প্রাচীনধর্মী। প্রশ্ন শুনে আমি উত্তর করতে গেলাম যে, "আমি ওটা করিনি, আগে থেকেই এমনটা আছে।" তৎক্ষণাৎ পূজনীয় স্বামী গীতানন্দজী ইঙ্গিতে আমাকে বারণ করলেন কথা বাড়াতে। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী তখনি নির্দেশ দিলেনঃ "এরকম বেখাপ্পা সাইজ এক্ষুনি পালটাও, পরের সংখ্যা থেকেই পালটাও।" কিন্তু সেই সময় বছরের মাঝামাঝি থেকে পত্রিকার সাইজ পালটানো কিভাবে সম্ভব? কেননা পালটাতে গেলে প্রেস, বাইন্ডার সবাইকে বলতে হবে এবং অন্য সমস্যাও আছে, এমনকী এর জন্য বিশেষ সময় ও খরচের বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর নির্দেশমতো করতে হলো। এব্যাপারে আমাদের সেসময় খুব বেগ পেতে হয়েছিল। তবে তাতে সত্যিই উদ্বোধনের চেহারাটা সুন্দর হয়েছিল। এই সুযোগে আমি মহারাজের কাছে অনুরোধ করেছিলাম আগের বছরের দেড় লক্ষ টাকা ঘাটতির ব্যাপারে কিছু ভাবতে। উনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেনঃ "ঠিক আছে, কোন চিন্তা নাই। ঐ টাকা বেলুড় মঠ থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু এবার থেকে নিজেরটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে।" প্রসঙ্গত বলে রাখি, শুরু থেকে উদ্বোধন সবসময় ঘাটতিতে চলেছিল। স্বামীজীর সময় স্বামীজী উদ্বোধনের জন্য কেনা(অর্থ তিনিই ব্যবস্থা করেছিলেন) প্রেসটি বিক্রি করে ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করেছিলেন।

যাই হোক, একদিন, সেটা এপ্রিলের শেষ দিকে, স্বামী সনকানন্দজী ও স্বামী ধর্মরূপানন্দজীর সঙ্গে ছাদে বিকেলে হাঁটছি। হঠাৎ স্বামী সনকানন্দজী বললেনঃ "আপনার পত্রিকার বার্ষিক হিসাব হয়ে গেল।" শুনেই ভয়ে বুকটা ধুকপুক করতে লাগল। ভাবলাম, প্রিন্টিং ইত্যাদির খরচ যা বেড়েছে তাতে আর্থিক অবস্থার অবনতি খুব স্বাভাবিক। এইসব ভাবতে ভাবতে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই উনি বললেনঃ " ভাল হয়েছে।" আমি বুকে বল পেয়ে বললাম ঃ "ভাল মানে, উদ্বৃত্ত হয়েছে?" শুনে গম্ভীর হয়ে বললেনঃ "হ্যাঁ।" আমি বললামঃ "কত?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ "পাঁচ হাজার?" উনি বললেনঃ "না, একটু বেশি।" "তাহলে কত?" "দশ হাজার?" উনি একটু গম্ভীরভাবে বললেন, "একটু বেশি।" এভাবে দশ, বিশ, পঁচিশ করতে করতে শেষে জানলাম, এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সেবছর উদ্বৃত্ত হয়েছে। অবিশ্বাস্য! তা কি করে হলো? এই প্রথমবার *উদ্বোধন*-এর ইতিহাসে উদ্বৃত্ত হলো। মায়ের কৃপা ছাড়া আর কীভাবে এমনটা সম্ভব? আমি নিজেও এর উত্তর খুঁজে পাই নি। সেসময় রোজ রাতে প্রসাদ পেতে গিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি ঃ "*উদ্বোধন*-কে বাঁচাও মা তুমি।" সেই থেকে আর আমাদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, *উদ্বোধন* চলেছে দ্রুত গতিতে।

আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম অর্থাৎ *উদ্বোধন-এর* সঙ্গে যুক্ত হলাম, তখন গ্রাহক সংখ্যা ছিল নয় হাজার। যখন কার্যভার ছাড়লাম ২০০১ সালে, তখন গ্রাহক-সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ষাট হাজার। নব্বই বছরে ন' হাজার আর আমার ১৪ বছরে ষাট হাজার! কোন হিসেবেই ব্যাপারটা মেলানো যায় না। কিন্তু প্রমাণিত হল যে, মায়ের ইচ্ছায় সব হয়। মা তো অঘটন-ঘটন-পটিয়সী!

এই সাফল্যের জন্য আমাদের কিছু সিদ্ধান্ত খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বিনীতভাবে বলি। প্রথমেই যেটা কার্যকর হয়েছিল তা গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গ্রাহক ও পত্রিকার মধ্যে নিবিড় যোগসাধন। গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্র আমার মাথায় শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাতেই আসে। এর সুফল *উদ্বোধন* আজও পাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে *নিবোধত* পত্রিকাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর ফলে খুব অল্প কালের মধ্যে বহু গ্রাহককে পেয়েছিলাম। বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে, এমনকী ভারতবর্ষের বাইরে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রগুলির আমন্ত্রণে প্রায়ই আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হতো। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কথা বলার পাশাপাশি উদ্বোধন-এর কথাও বলতাম। দেখতাম, সকলের কী আগ্রহ এই পত্রিকাকে নিয়ে। *উদ্বোধন*-এর সূত্রেই প্রথমবার বিদেশভ্রমণ হয় আমার। ভ্যাটিকান সিটি থেকে দ্বিতীয় পোপ জন পল-এর কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসে এবং আমি ভ্যাটিকান যাই ও পোপের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভ্যাটিকান টেলিভিশন থেকে সেই সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিতও হয়। বিপুলসংখ্যক গ্রাহকের উপযোগী লেখা নিয়েও আমাদের প্রতিনিয়ত ভাবতে হয়েছে। আমরা কয়েকটি নতুন নিয়মিত বিভাগ এনেছিলাম, যেগুলি বিশেষরূপে গ্রাহকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। এইগুলির মধ্যে ছিল স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, খেলা, ছোটদের বিভাগ, 'প্রাসঙ্গিকী' প্রভৃতি। মনে আছে, প্রাসঙ্গিকী বিভাগ যখন শুরু করতে যাচ্ছিলাম তখন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বলেছিলেন ঃ " এসব করতে যেও না। কে কী লিখবে, হয়তো আমাদের বিরুদ্ধেই লিখবে!" এসব শুনে আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলামঃ "ছাপব তো আমরাই, তাই বাছাই করে নেব, আপনি চিন্তা করবেন না।" পরে দেখেছি, সমালোচনামূলক পত্র কখনো-কখনো দু-একটি এলেও বিরুদ্ধ লেখা তেমন আসেনি এবং 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। বিস্মিত হয়ে দেখেছি, কী অপরিসীম জিজ্ঞাসা নিয়ে একের পর এক চিঠি এসেছে কিংবা কোন কিছুর আলোচনায় কেউ নতুন তথ্য দিয়েছেন বা জানতে চেয়েছেন-- যা রীতিমতো গবেষণার বিষয় হতে পারে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে *উদ্বোধন* লেটার প্রেস থেকে অফসেটে আসে ১৯৯৭ সালে। এতে খরচ অনেক বাড়লেও পাঠকদের পড়তে আনন্দ হয়, আমাদের কাজের ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা হয়। কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া বিপুলসংখ্যক গ্রাহকের যাবতীয় হিসাব রাখাও সহজ হতো না। সেসময় মায়েরই কৃপাতে

দুজন ভক্ত উদ্বোধনের সমস্ত খরচ বহন করতে এগিয়ে আসেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দের নামাঙ্কিত গঠিত হয় দুটি স্থায়ী তহবিল।

সেসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ঘটনা হলো--- *উদ্বোধন*-এর শতবর্ষে পদার্পণ। ১৯৯৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ছিল *উদ্বোধন-এর* শততম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে মাঘ সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি যখন তৎকালীন সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজীর হাতে তুলে দিলাম, তখন তিনি বলেছিলেনঃ " শতবর্ষে পদার্পণ নিশ্চয়ই আনন্দের, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আরো অনেক শতবর্ষ *উদ্বোধন* সগৌরবে অতিক্রম করবে। তবে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশীর্বাদের শক্তিতেই তা করবে।" সেবছর ১৫ জানুয়ারি অর্থাৎ ১ মাঘ মায়ের বাড়িতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় *উদ্বোধন* কার্যালয়ের সারদানন্দ হল-এ তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। এদিন সান্ধ্য সভায় ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দজী ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ভাষণে বললেনঃ " উদ্বোধন না থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দরিদ্রতর হয়ে যেত। উদ্বোধন বাংলা ভাষাকে নতুন প্রাণশক্তি দিয়েছে।" সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন সহ-সংঘাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ । সেদিন তিনি অধ্যাপক বসুর বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেনঃ "অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থই বলেছেন 'উদ্বোধন' না থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দরিদ্রতর হয়ে যেত। এই কথাটি 'উদ্বোধন' সম্পর্কে একটি অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য, কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এভাবেই উদ্বোধন অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকবে চিরকাল।" দ্বিতীয় দিনের সভায় ভাষণ দেন স্বামী রমানন্দজী ও স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ। তৃতীয় তথা শেষ দিনের সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান ও স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। সেসময় বিভিন্ন সংবাদপত্র, দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে গুরুত্ব সহকারে এই শতবর্ষের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছিল। ভক্তমহলেও বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল। *উদ্বোধন*-এর গ্রাহকসংখ্যা পাঁচ হাজার বেড়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর একনিষ্ঠ সেবক চন্দ্রমোহন দত্তের কথা মনে পড়ে। তিনি কাঁধে করে *উদ্বোধন* লোকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতেন। বলতেনঃ "বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় মনে হতো, আমি মায়ের চরণ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি।" একারণেই পত্রিকায় আমরা লেখা শুরু করলাম--- 'উদ্বোধন-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া' বা 'উদ্বোধন শুধু পত্রিকামাত্র নয়, উদ্বোধন তাঁদের ভাব ও বাণীশরীর'। লক্ষ্য করেছি, মানুষের কাছে এই কথাগুলি বারবার বিশেষ আবেদন ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল।

আমরা সেসময় নিত্যনতুন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতাম ভাল ভাল লেখকদের লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করতে। সেসময় *উদ্বোধন*-এ লিখতেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিমাইসাধন বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর লেখা প্রতি সংখ্যাতেই থাকত, পাঠকেরা খুব পছন্দ করতেন। বহু নতুন লেখকও সেসময় নানাবিধ প্রবন্ধ লিখে পত্রিকার গুরুত্ব অনেকাংশে বর্ধিত করেছিলেন। তবে *উদ্বোধন* কীভাবে যে এমন সাজানো-গোছানো হলো, আমি আজও জানি না, এ সবই মায়ের মহিমা। *উদ্বোধন*-এ কোনো বিনোদনমূলক বা রাজনীতি বিষয়ক লেখা বের হয় না---অথচ, উদ্বোধন বর্তমান সময়ে বিশেষ জনপ্রিয়; এখন *উদ্বোধন*-এর কী বিপুল সমাদর তার, বাঙ্গালির ঘরে ঘরে! তখন দেখেছি নামী-দামী পত্রপত্রিকা সব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সাপ্তাহিক পত্রিকা পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে, কারণ পত্রিকা চলছে না। এটা ঠিক যে, মানুষের পড়ার অভ্যাস এখন প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু *উদ্বোধন* এক বিরল ব্যতিক্রম হয়ে উঠল। এর পিছনে ছিল মায়ের আশীর্বাদ। কারণ মায়ের বাড়ীই যে উদ্বোধনের গর্ভগৃহ। বস্তুত তাঁর চরণপ্রান্তে থেকেই তো *উদ্বোধন*-এর সারস্বত সাধনা।

আমি করজোড়ে মাকে প্রণাম করে রোজ বলতাম ঃ "মা, তুমিই দেখ তোমার *উদ্বোধন*-কে। তুমি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে? তুমিই দেখ।" মা সবই

করাচ্ছেন। সেজন্য আজ আমরা *উদ্বোধন* পত্রিকার একশো পঁচিশ বছরে পদার্পণ দেখছি। এই শুভ দিনের মাহাত্ম্য আজ থেকে বহুগুণ বর্ধিত হলো। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জয়! জয় উদ্বোধন-এর জয়!

'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।